সুন্দরবনের বাউলে-মৌলে-জেলে জীবনকেন্দ্রিক লোকাচার ও সংস্কার

শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

১. মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের আর এক নাম সুন্দরবন। সে মুগ্ধতা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যপট কিংবা অপার সৌন্দর্যের জন্য নয়; সুন্দরবনের জল ও জঙ্গালজীবী প্রান্তিক মানুষদের-বিশেষত বাউলে-মৌলে-জেলে-মিনমারী-কাঁকড়ামারী ইত্যাকার লোকপেশার সঙ্গে জড়িত জীবন-আচার-প্রথা-বিশ্বাস-সংস্কার কিংবা গহন অরণ্যে কাষ্ঠ আহরণ, মধু অন্বেষণ, নদীতে মৎস্য আহরণ, এককথায় কঠোর জীবনসংগ্রাম (Struggle for Existence) করে বেঁচে থাকার মুগ্ধতা। সুন্দরবনের এহেন প্রান্তিক মানুষদের জীবনচর্যা ও জীবনচর্চায় লোকসংস্কৃতির এক স্বতন্ত্র দিকের সন্ধান মেলে বৈকি। তাদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আজ গবেষণার বিষয়।

১.১ সুন্দরবনের ভৌগোলিক বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণাংশ এবং বাংলাদেশের সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, কক্সবাজার জেলার দক্ষিণাংশ নিয়েই সামগ্রিক সুন্দরবন, যার সর্ব মোট আয়তন ২৫৫০০ বর্গকিলোমিটার। ভারতীয় সুন্দরবনের মোট আয়তন ৯৬৩০ বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে ৪২৬৪ বর্গ কিমি ম্যানগ্রোভ অরণ্য, অবশিষ্ট ৫৩৬৬ বর্গ কিমি গ্রাম- গঞ্জ, শহর নগর মৌজা, খাল-বিল-নদী-নালার আবিষ্ট।[১] সুন্দরবনে ৩১টি ছোটো বড় নদী ও ১০২টি দ্বীপ বর্তমান। তার মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করে।

১.২ সুন্দরবনের জাতি-সমন্বয় ও সাংস্কৃতিক মিশ্রণ : আমরা জানি, সুন্দরবনে চারটি জনগোষ্ঠীর চতুর্বেণী সঙ্গম ঘটেছে। সুন্দরবনের স্বতন্ত্র সংস্কৃতির পশ্চাতে এই চতুর্বিধ জনগোষ্ঠীর ভাবধারার সংমিশ্রণই ক্রিয়াশীল।

১. গঙ্গা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠী।

২. ছোটোনাগপুর, রাঁচি, মানভুম, সিংভুম থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠী।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তী পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী।

৪. প্রাচীন পৌণ্ড্র ও মুসলমান সম্প্রদায়, যারা এই অঞ্চলের ভূমিজ।

এহেন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ ভাবধারা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে আজ সুন্দরবন মিশ্রসংস্কৃতির এক ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ধর্মীয় আচার আচরণে তাদের মধ্যে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে এক মজ্জাগত আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে—তারা একবাক্যে সুন্দরবনের অধিবাসী, এক লোকায়ত জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ। বাউলে-মৌলে-জেলে-মিনমারী-কাঁকড়া মারী-ইত্যাকার লোক-পেশাকে আত্মীকরণ করেছে সুন্দরবনের মানুষ। শুধুমাত্র হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে নয়, তাদের লড়াই করতে হয়েছে 'দানো-ঝুটো', 'বাঘা ভূত', 'পেডো

ভূত'-এর সঙ্গে (এটা তাদের বিশ্বাস)। লড়াই করতে হয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররোষ-ঝড়-জল-বন্যা-মহামারি-মন্বন্তরের সঙ্গেও। ফলত তাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এক অলঙ্ঘ্য ও অলক্ষ্য প্রতিযোগিতা-টানাপোড়েন। তাই স্বভাবতই তাদের জীবনবৃত্তে জড়িয়ে আছে মানা-টোটেম-ট্যাবু সঞ্জাত নানাবিধ আচার-প্রথা-সংস্কার, লোকবিশ্বাস।

১৭৮০-১৮৭৩ এই কালপর্বে জমি উদ্ধার হয়েছিল হাড়োয়া, হাসনাবাদ, ভাঙ্গাড়, কুলপিতে এবং তার পরেপরেই হিঙ্গালগঞ্জ মিনাখাঁ ক্যানিং জয়নগর মথুরাপুর সাগর অঞ্চলে জঙ্গাল হাসিলের কাজ সম্পন্ন হয়। ১৮৭৩-১৯৩৯ এই কালপর্বে জঙ্গাল হাসিল করা হয় সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তি, কুলতলি, গোসাবা, হিঙ্গালগঞ্জ এর বাকি অংশ। ১৯৫১-১৯৭১ এই পর্বে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুরা আবাদ পত্তন করে হিঙ্গালগঞ্জ গোসাবা কুলতলি পাথরপ্রতিমা সাগর নামখানা কাকদ্বীপ অঞ্চলে।[২] সুতরাং প্রান্তিক পৌণ্ড্র ও মুসলমান, মেদিনীপুর, আদিবাসী ও বঙ্গাল—এই চার শ্রেণির দারিদ্র্যপীড়িত হাভাতে খেটে খাওয়া মানুষরাই সুন্দরবনের আধুনিক সভ্যতা নির্মাণের কারিগর। বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে এরা সুন্দরবনের সভ্যতার জন্ম দিয়েছে।

২. সংস্কৃতি-লোকসংস্কৃতি-আঞ্চলিক বা গোষ্ঠীসংস্কৃতি ও সুন্দরবন : 'সংস্কৃতি' (Culture)-মানুষের সামগ্রিক জীবনবোধ, জীবনবিকাশ ও সমাজের সার্বিক অভাবের মধ্যে সংস্থিত এমন এক সৌধ—"স্রষ্টার জ্ঞান ও পরিশীলন নিয়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে বহমান।"[৩] তাই "সংস্কৃতি সমাজদেহের মধ্যে শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়।"[৪] সমাজস্থ মানুষের জ্ঞান-বিশ্বাস-নৈতিকতা,প্রথা-আচার-অভ্যাস, শিল্প-সাহিত্য—এ হেন সমূহ বৃত্তেই সংস্কৃতির পূর্ণায়ত রূপ। ই.বি টাইলার যথার্থই বলেছেন—

> Culture is that complex whole which includes knowledge belief, art, moral, law, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of, society.[৫]

একটা জাতি বা সভ্যতার বিকশিত রূপ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়—সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ সাধন তথা "সভ্যতা তরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি।"[৬] 'সংস্কার' থেকে আগত শব্দটির অর্থ করা হয়েছে: পরিশোধন-পরিমার্জন কিংবা অভ্যাসজনিত বাসনা।[৭] আসলে 'সংস্কৃতি' মানবজীবনের অন্তর্নিহিত ঐক্যের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এর পশ্চাতে দু'টি অর্থই ক্রিয়াশীল—

১. মন তথা উপলব্ধিকে সংস্কার বা মার্জনা করা।
২. ঐতিহ্যগতভাবে এক একটা ভাবনা ও অভ্যাসকে বিবর্তিত করা।[৮]

অর্থ সংকোচনের ফলে নিম্নবর্ণের মানুষকেই 'লোক' অর্থে বোঝানো হচ্ছে।[৯] এই 'লোক' তথা 'জন' কোনো একক ব্যক্তি নন, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বসবাসকারী একটি সংহত সমাজের অঙ্গ বিশেষ।[১০] লোকসংস্কৃতি তাই লোকঐতিহ্যেরই স্মারক, যেখানে উক্ত গোষ্ঠীর সমাজদর্শন, আচার-আচরণ, জৈবনিক অভিজ্ঞান, মানস ইতিহাস—সবই মূর্ত হয়ে ওঠে। লোক মানসপ্রসূত সংস্কারকেই আমরা বলি লোকসংস্কার। তবে শুধু নিরক্ষর বা অর্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্কারকে লোকসংস্কার বললে একদর্শিতা দোষে দুষ্ট হতে হয়। যে মানসিক প্রবৃত্তির মধ্যে যুক্তি

(Reason) অপেক্ষা অযুক্তির (Unreason) প্রাধান্য বেশি[১১] সেটাই হবে লোকসংস্কার, তা সে নিরক্ষর, অর্ধ শিক্ষিত বা শিক্ষিত ব্যক্তিও হোন না কেন। 'আঞ্চলিক' তথা 'গোষ্ঠীসংস্কৃতি' একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল তথা ভূখণ্ড ও গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জীবনচর্চা-জীবনচর্যা, আচার-আচরণ- অভ্যাস-বিশ্বাস-সংস্কার সবই মূর্ত হয়ে ওঠে আঞ্চলিক তথা গোষ্ঠীসংস্কৃতিতে।

৩. সুন্দরবনের লোকাচার-প্রথা-সংস্কার : সুন্দরবনে ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্রের সিদ্ধহস্ত ব্যক্তিরাই বাউলে বা গুণিন নামে পরিচিত। জঙ্গালের হিংস্র বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অরণ্যজীবী মানুষ একজন গুণিনকে সঙ্গে রাখতেন, যারা বাউলে নামে পরিচিত। বর্তমানে কাঠ কাটানিয়াদেরও বাউলে বলা হচ্ছে। আমরা আলোচ্য নিবন্ধে বাউলে বলতে সুন্দরবনের কাষ্ঠ আহরণকারীদেরই বুঝবো। আর সুন্দরবনের গহন জঙ্গালে মৌচাক ভেঙে মধু অন্বেষণকারীরাই হলো মৌলে। আর সুন্দরবনের খাড়ি-ভরানি-দোয়ানি-হাতানি-নদী-নালা-খাল-বিল-সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণকারীরাই জেলে বা মাছমারা। কিন্তু মাছমারা বলতে শুধু মৎস্য আহরণকারীকেই বুঝবো না; যারা মাছ মারে, দোন ফেলে, মীন ধরে, কাঁকড়া মারে— সকলকেই একত্রে জেলে হিসেবে দেখছি, আলোচ্য নিবন্ধে।

এহেন প্রান্তিক মানুষগুলি যেহেতু দৈববলে বলীয়ান হয়ে জঙ্গাল যাত্রা করে, সেহেতু সেই সূত্রে এসে যায় তাদের জীবন ও কর্ম নির্দেশক সাইদার, বহরদার ও দেয়াসিদের কথা। এঁরা তন্ত্র-মন্ত্র জানা সাধক ব্যক্তি। বাউলে-মৌলেরা জঙ্গালের হিংস্র জীব-জন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে যেসব গুণিনদের সঙ্গে নিয়ে যায় জঙ্গালে, তারা বহরদার ও দেয়াসি নামে পরিচিত। আর সুন্দরবনের মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের নির্দেশক হলো সাইদার। সমুদ্রগামী নৌকাগুলির মধ্যে যিনি সর্দার, তিনিই 'সাইদার' নামে পরিচিত। ফলত এহেন মানুষদের জীবনবৃত্তে জড়িয়ে মানা-টোটেম-ট্যাবু সঞ্জাত নানাবিধ লোকাচার। আমাদের আলোচনা সেই দিকেই।

বাউলে-মৌলে-জেলে-মিনমারী-কাঁকড়ামারী নামধারী প্রান্তিক লোকসমাজ মানা-টোটেম-ট্যাবু, জাদু ইত্যাকার লোকবিশ্বাসকে আত্মস্থ করেই জীবিত। ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা, জঙ্গালে পথভ্রষ্ট হওয়া কিংবা বাঘের মুখে পতিত হওয়া প্রভৃতি ঘটনার পশ্চাতে এক অলক্ষ্য ও অলঙ্ঘ্য শক্তির কথাই কল্পনা করে, ই.বি. টাইলার যাকে বলেছেন 'আনিমিজম'। আর আর ম্যারেট এরই নাম দিয়েছেন 'Animatism'। জঙ্গালজীবী মানুষদের লোকায়ত ভাবনায় তাই সর্বপ্রাণবাদের আদিম স্তর নিহিত, বলা যেতে পারে। ব্যক্তিজীবনে মানা-টোটেম-ট্যাবু সঞ্জাত কতগুলি সংস্কার বাউলে-মৌলে-জেলে জীবনকে পরিচালিত করছে। যেমন—

১. জাদুবিশ্বাস ও অলৌকিক সংস্কার সঞ্জাত বিশ্বাস- আশাবাড়ি ও ছাটাবাড়ির মাহাত্ম্যকথা।
২. অপশক্তি-আত্মা-ভূত-প্রেত ও দেবদেবী বিষয়ক সংস্কার—বনবিবি, নারায়ণী, শাহজঙ্গালি,দক্ষিণরায়, বিশালাক্ষী, ছাওয়াল পিরের সন্তুষ্টি বিধান।
৩. শুভ সংগঠক ও অশুভরোধক বিশ্বাস ও সংস্কার—নৌকার মাথাকে 'চণ্ডী' কল্পনা করে সেই 'নৌকাচণ্ডী'তে পুজা প্রদান।
৪. বার-তিথি-সময় বিষয়ক সংস্কার—শুক্রবার, চতুর্দশী অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে জঙ্গাল

যাত্রা নিষিদ্ধ।

৫. শব্দ উচ্চারক ও বাক্‌রীতি সম্বন্ধীয় সংস্কার—বাঘকে 'বাবু', 'মামা', 'বড় মিঁয়া', মৌমাছিকে 'পোকা', জঙ্গলকে 'বাগান', কুমিরকে 'কাঠের গুঁড়ি' বলা।

স্মরণীয় যে মন্ত্রপাঠের দীক্ষিত ব্যক্তিরাই 'সাধক', 'শামান', 'গুনিন' ইত্যাকার অভিধায় ভূষিত। এরা অদৃশ্য, অপ্রতিরোধ্য, নৈসর্গিক (impersonal), অতিপ্রাকৃত (Super natural) ও অতীন্দ্রিয় শক্তিকে ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতায় বশীভূত করতে পারেন। শামানরা অস্থিরচিত্ত, আবেগাপ্লুত, আত্মসমাহিত অবস্থায় থাকে।[১২] মানুষ তাই এইসব ব্যক্তিকে মাধ্যম করল ব্যক্তিজীবনের মঙ্গলামঙ্গল আনয়নে, দুর্বিপাক নিরসনে ও দেবদেবী, দৈত্য-দানবের সন্তুষ্টি বিধানে। এইসব সাধক গুণিনরাই সুন্দরবনে বহরদার-দেয়াসি নামে পরিচিত। সাধক-গুনিনদের সর্বদা শুদ্ধাচার পালন করতে হয়, নানাবিধ নিষেধ-বিধি মান্য করতে হয়। যেমন- স্ত্রীগমন, খাদ্যের ক্ষেত্রে বাছবিচার, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি।[১৩]

৩.১ লোকাচার ও মন্ত্রশক্তির ব্যবহার : সুন্দরবনের পঁচানব্বই ভাগ কৃষিনির্ভর সমাজের মধ্যে ষাট শতাংশ[১৪] ভূমিহীন মানুষ সুন্দরবনের অরণ্যসম্পদ ও জলজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই সুন্দরবনের বাউলে মৌলেরা ঠাকুরান, মামলা, বিদ্যা, ভাঙাদুনি, গোসাবা হাড়িয়াভাঙ্গা নদীতীরবর্তী ধনি, বিজিয়াড়া, কলস, কেঁদোখালি, সিন্দুরকাঠি প্রভৃতি জঙ্গলে পদার্পণ করে। সর্বাগ্রে নৌকার অগ্রভাগকে 'চণ্ডী রূপে' কল্পনা করে নৌকাচণ্ডীর পুজো প্রদানের মধ্যে দিয়েই যাত্রার শুভ সূচনা করে তারা। নৌকাচণ্ডীতে সিঁদুর লেপন ও ধূপ-ধুনা প্রজ্জ্বলন করা হয়।

চতুর্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তারা জঙ্গলযাত্রার সূচনা করে না। এমনকি শুক্রবার নৌ-যাত্রা থেকে বিরত থাকে। কেননা শুক্রবার মা বনবিবি ও শাহাজঙ্গালির জন্মদিন। স্মরণীয় যে, কখনও কখনও মাসাধিককাল কাঠুরিয়া ও মৌলেরা জঙ্গলে সময় অতিবাহিত করে। সেক্ষেত্রে সপ্তাহের শুক্রবার (জুম্মা বার) আসা মাত্রই নিদেনপক্ষে একটা বেলা (দুপুর একটা পর্যন্ত) মৌচাক ভাঙা কিংবা কাঠ কাটার কাজ স্থগিত রাখে। কেননা, এদের বিশ্বাস মা বনবিবি শুক্রবার মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহে নামাজ পড়তে যান।

জঙ্গলে পদার্পণ করার পর নানাবিধ ক্রিয়া- আচার সম্পন্ন করতে হয় বাউলে মৌলেদের। নতুবা কাঙ্ক্ষিত ফল মিলবে না বলে তাদের বিশ্বাস। বাদাবনের মূলত তিন অধিষ্ঠাত্রী দেবী- বনবিবি, শাহজঙ্গালি ও নারায়ণীর সন্তুষ্টির উপর দাঁড়িয়ে থাকে তাদের ভাগ্য। সাঁওতালদের 'মারাংবুরু', তারা ভাই 'মনিকো' ও বোন 'জহুর আরা'[১৫]—এই তিন দেবীর সমান্তরাল বিন্যাস আমরা দেখতে পাচ্ছি দক্ষিণের বাদাবনেও, জঙ্গাল মাতা বনবিবি, তার ভাই শাহাজঙ্গালি ও কাষ্ঠদেবী নারায়ণী যেন খ্রিস্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের সম্পূরক হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

যাইহোক, বনবিবি, নারায়ণী, শাহজঙ্গালি, বিশালাক্ষী, ছাওয়াল পিরদের পুজোপ্রদান ও সন্তুষ্টি বিধানের প্রয়োজনীয় উপাচার সঙ্গেই নিয়ে যায় বাউলে মৌলেরা। বনবিবি, নারায়ণীর জন্য আবির, ফলমূল, আয়োসাজ, মিষ্টান্ন, এমনকি মুসলমান বাউলেরাও আবির সিন্দুর আলতা সরষের তেল সঙ্গে নিতে ভোলে না। কিন্তু 'ছাওয়াল পির' সম্পর্কে একটা নেতিবাচক মনোভঙ্গি বিদ্যমান। সাধারণত গামা গাছ ও বানী গাছের গোড়ায় সামান্য পরিষ্কারপূর্বক

সেখানে কাদার মূর্তি তৈরি করে বনবিবি, নারায়ণীদের নামে পুজো দেয়। দেব-দেবীরা যে বৃক্ষের সঙ্গে একীভূত, পুরাণ মাত্রই তার সাক্ষ্য দেয়। রেন্ডল হ্যারিস প্রমাণ করেছেন, 'আইভিলতা' গাছ থেকে গ্রিক দেবতা 'ডিওনিসাস', 'ওক' গাছ থেকে 'জিউস' এবং 'আপেল' গাছ থেকে 'আপোলো' দেবতার উদ্ভব—"Dr. Rendell Haris has made out a good case that Dionysus free out of the ivy, Zeus out of the Oak and Apollo out of the apple-tree."[১৬] সুন্দরবনের জঙ্গলজীবী মানুষও তেমনি গামা গাছকে 'নারী' গাছ অর্থাৎ মা নারায়ণীর প্রতীক ও বাণী গাছকে 'পুরুষ' গাছ অর্থাৎ বাবা আটেশ্বর-এর প্রতীক হিসেবে কল্পনা করে এবং সেখানে ভক্তিসহকারে পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করার পর কমপক্ষে একটি দিন বিশ্রাম নেয়। তারপর গাছ কাটতে কিংবা মধু অন্বেষণ করতে জঙ্গলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে।

কাঠকাটানিয়া বাউলে কিংবা মধু অন্বেষণকারী মৌলেরা বাদাবনের হিংস্র জন্তু জানোয়ার, ভূত-প্রেত, দানো-ঝুটোর উপদ্রব থেকে রক্ষা পেতে এবং স্বীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে একজন গুণিনকে সঙ্গে নিয়ে যায়। তারা 'বহরদার' ও 'দেয়াসি' নামে পরিচিত। এরা বাউলে মৌলেদের সার্বিক নির্দেশক (Overall guide)-এর ভূমিকা পালন করে। বহরদার ও দেয়াসিরা তান্ত্রিক সাধক পুরুষ। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর বহরদাররা মা বনবিবির কাছ থেকে এক আশ্চর্য জাদুদণ্ড—'আশাবাড়ি' লাভ করে। পক্ষান্তরে দেয়াসিদের শাহজঙ্গালির কাছ থেকে প্রাপ্ত হয় 'ছাটাবাড়ি'।[১৭] মনে করি, এই 'আশাবাড়ি' ও 'ছাটাবাড়ি' ভাবনাটি ইসলামধর্ম প্রসূত। বিশ্বের কলুষতা মুক্ত করতে আল্লাহ যুগে যুগে দূত প্রেরণ করেন, যাদেরকে 'নবী' বলা হয়। এমনই একজন নবী হযরত মুসা (আ.)-র হাতে সর্বদা একটি দণ্ড থাকতো, যা ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন। পবিত্র কোরআন শরীফে এই দণ্ড ('আশা' শব্দটির অর্থ দণ্ড) দ্বারা হজরত মুসার নানাবিধ অলৌকিক কর্মকাণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর 'আশা'র স্পর্শে নদীর জলতল চিরে ভূমি জেগে ওঠার মতো অলৌকিক কাণ্ড সম্পন্ন করেছেন হযরত মুসা। এর সঙ্গে সুন্দরবনের দেব-দেবীদের আশাদণ্ড (বনবিবি), ছাটামুগুর (বাবা আটেশ্বর) ধারণ ও বহরদার-দেয়াসিদের-আশাবাড়ি ছাটাবাড়ির প্রচলন গভীর সাদৃশ্যযুক্ত।[১৮] যেক্ষেত্রে জঙ্গলজীবী মানুষ গুণিন নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে তারা গুণিনের মন্ত্রপূত একটি 'লালসালু' সঙ্গে নেয় এবং বিপদের সম্মুখীন হলে তারা তা মাথায় ফেট্টি করে পরে নেয়।[১৯]

বহরদার ও দেয়াসিদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রবল। দেয়াসিদের তুলনায় বহরদাররা নিজেদের উচ্চবর্গের বলে মনে করে। উভয়েরই কাজ হিংস্র জীবজন্তুদের হাত থেকে মন্ত্র সহযোগে জঙ্গলজীবীদের রক্ষা করা। দেয়াসিরা উচ্চমানের কাঠ ও মধুর লোভে কোন একজনকে বাঘের মুখে তুলে দেয়। হয়তো এজন্যই তাদের নাম হয়েছে দেয়াসি, অন্তত এমনটাই মনে করে বহরদাররা।[২০] বহরদারদের এই আশাবাড়ি এক আশ্চর্য জাদুদণ্ড বিশেষ, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতোই যেন।

৩.২ মৌলে-জীবনাচার ও মন্ত্রশক্তির উজ্জীবন : এবার আসি মৌলেদের কথায়। দশ-পনেরো জনের এক একটি দল মধু অন্বেষণে দু-তিন সপ্তাহের জন্য পাড়ি দেয় জঙ্গলে। ভালো মৌচাক চিনবার একটা অত্যাশ্চর্য কৌশল আছে মৌলেদের। প্রথমেই কোনো উঁচু

গাছের মগডালে উঠে দেখে নেয় কোনো কোনো জায়গায় 'পোকা' (মৌলেরা মৌমাছির পরিবর্তে 'পোকা' শব্দটি ব্যবহার করে) উড়ছে। ওড়ার ভঙ্গি দেখেই মৌলেরা 'ভরা' ও 'খালি' পোকার জাতি নির্ণয় করে। যেসব পোকা (মৌমাছি) ঝাঁক বেঁধে ওড়াউড়ি করে, তারাই 'ভরা পোকা' মধুতে পরিপূর্ণ। ওড়বার সময় এদের পা লম্বালম্বি ঝুলে থাকে। পক্ষান্তরে 'খালি পোকা'রা সশব্দে উড়ে যায়। এভাবেই মধুতে পূর্ণ মৌচাককে সর্বাগ্রেই খুঁজে নেয় মৌলেরা।

সুদূর হিমালয় থেকে মৌমাছিরা বসন্তের আগমনে সুন্দরবনের গরান, গেওয়া, গর্জন, সুন্দরী, খোলসে গাছে এসে বাসা বাঁধে। এহেন অতিথি মৌমাছিদের পোশাকি নাম 'রকবি' বা 'পাহাড়ি মৌমাছি'। প্রাণীতত্ত্ববিদদের ভাষায়—'এপিস ডরসটা'।[২১] কালচে রঙের, প্রায় দু'সেমি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই মৌমাছিদের মধু সঞ্চয়ের পরিমাণ সর্বাধিক। কিন্তু এদের হিংস্রতা ও ভয়ংকরতা বাঘের মতোই। তাই মৌলেদের ভাষায় এরা 'বাঘা মৌমাছি'।

মৌচাক ভাঙার একটি নির্দিষ্ট পন্থা আছে মৌলের। বগড়া বা হেতাল পাতা ভেঙে প্রথমেই 'কুস্তে' বা 'ভোর' বানায়। কুস্তের অভ্যন্তরে থাকে শুকনো পাতা ও বাইরে থাকে কাঁচা পাতার আচ্ছাদন—যা আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া উৎপাদনের এক উৎকৃষ্ট পন্থা বিশেষ। ধোঁয়ায় দিকভ্রষ্ট হয়ে মৌমাছিরা উড়ে চলে যায়। তৎক্ষণাৎ মৌলে দল সেই মৌচাক ভেঙে নিংড়ে মোম ও মধুকে পৃথক করে। সাধারণত এক একটা চাক থেকে দশ-পনেরো কেজি মধু পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে মোমের পরিমাণ দাঁড়ায় এক থেকে দেড় কেজি।

বহরদারদের অলৌকিক মন্ত্রশক্তির কথা মৌলেদের মুখ থেকেও শোনা যায়। চাকে ঘা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘা মৌমাছির দল ছোবল মারতে আসে। তদুপরি আছে হেতাল বনে আত্মগোপন করে থাকা বাঘের ভয়ও। কিন্তু অদূরে বহরদার আশাবাড়ি নিয়ে দণ্ডায়মান। ভড়কি চালে বাঘকে ভয় দেখানোর এক সহজ পন্থা আছে মৌলেদের। বৃহৎ গোঁফ, টিকালো নাক, এক জোড়া ভ্রু ও বড়ো বড়ো চোখ আঁকা একটা কিম্ভূতাকৃতি মুখোশ পরে মাথার পশ্চাতে।[২২] যেন দু-মুখো মানুষ। মৌলের জঙ্গলে আগে বাড়ে। পেছন থেকে আচমকা কোনো বাঘ এসে পড়লে যাতে সেই কিম্ভূত আকৃতি মুখোশ দেখে ভয়ে পালিয়ে যায়, এটা তারই এক উপায় মাত্র।

৩.৩ সুন্দরবনের জেলে জীবনকেন্দ্রিক লোকাচার ও সংস্কার—হাতচাল পদ্ধতি : ডিসেম্বর-জানুয়ারি মূলত শীতকালেই গলদা মিন, পার্সে মিন, পুষ্টিকর কাঁকড়া ও নানা জাতের মাছের আনাগোনা হয় মাতলা, মাকড়ি, ঠাকুরণ, বিদ্যা নদীতে। দশ বারো দিনের জেলেরা প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় জল সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মৎস্য আহরণে। সাধারণত দশমী একাদশীতে কোটালের জন্ম হয়। একাদশীর সকালে জেলেরা নৌকাচণ্ডীর পুজো সম্পন্ন করে পাড়ি দেয় নদীবক্ষে। দ্বিতীয়া তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী পর্যন্ত মৎস্য ও চিংড়ি আহরণের কাজ চলে। অষ্টমীর পূর্বে গৃহাভিমুখে রওনা দেয়।

নদীবক্ষে ভাসমান অবস্থায় জেলেদের কিছু কিছু লৌকিক আচার ও ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। প্রত্যহ দুপুরে ও সন্ধ্যায় খাদ্য গ্রহণের পূর্বে 'নৌকাচণ্ডী'তে ধূপ-ধূনা দিতে হয়। যেহেতু তাদের সঙ্গে 'বহরদার' বা 'দেয়াসি' থাকে না, থাকে 'সাইদার' তাই তারা নৌকাচণ্ডীকেই তোওয়াজ করে বেশি। এদের বিশ্বাস, নৌকা থেকে মাঝে মাঝে ঘ্যা ঘঁ (ব্যাঙ ডাকার অনুরূপ)

শব্দ উত্থিত হয়ে বিপদের পূর্বাভাস জানান দেয়। মা বনবিবি, নারায়নী, বিশালাক্ষীরাই নাকি জীবন্ত নৌকার রূপ ধরে ভক্তদের বিপদ উদ্ধারের চেষ্টা করে। জেলেরা নাকি 'জীবিত কাঠের' অস্তিত্বের টের পায়। ছোট্ট স্পিড বোট যেমন জলতল চিরে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলে, তদ্রূপ 'বিমকাঠ'ও নদিবক্ষে নৌকার মতো চলাচল করে জেলেদের উক্ত বিপদযুক্ত স্থানে জাল পাতা থেকে বিরত রাখে। সবই মা'য়ের কৃপা—এহেন লোকবিশ্বাসের আদিম স্তর কোথায় নিহিত, তা গবেষণার অপেক্ষা রাখে বৈকি!

জেলে জীবনকেন্দ্রিক একটি লোকবিশ্বাস হলো—'হাতচাল' পদ্ধতি। যেহেতু তন্ত্র-মন্ত্রের খুব একটা স্থান নেই ধীবর জীবনে, তাই নৌকা বিহারের মা নারায়নীর আজ্ঞালাভ জরুরি হয়ে পড়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের কাশিনগরে অবস্থিত নারায়নীর মন্দিরে মায়ের পায়ে জবা ফুল প্রদান করা হয়। সেই ফুল মা-এর পা থেকে গড়িয়ে পড়ার অর্থ মাতৃআজ্ঞা লাভ। উক্ত ফুল শুকনোর পর মাদুলি হিসেবে পরিধান করে। লোকবিশ্বাস, তুলারাশি যুক্ত কোনও ব্যক্তি সেই মাদুলি হস্তে ধারণ করলে তার হাত স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলতে থাকে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জেলেরা তাদের নৌযাত্রা স্থান নির্ণয় করে। চার-পাঁচটি ছোটো ছোটো কাগজে বিভিন্ন স্থানের নাম লিখে মাদুলি পরিহিত তুলারাশি যুক্ত হাতের সামনে রাখা হয়। হাতটি তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো একটি কাগজের দিকে ধাবিত হয়। উদ্দিষ্ট কাগজের স্থাননাম অনুযায়ী জেলেরা নৌ-যাত্রার তোড়জোড় করে। জলে জঙ্গলে সমস্ত বিপদ উদ্ধারের ভিত এখান থেকেই সূচিত।

তথ্যের সন্ধানে

১. ধূর্জটি নস্কর : 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', শ্যামলী পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৯

২. কমল চৌধুরী : চব্বিশ পরগনা, উত্তর-দক্ষিণ- সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, পৃ. ৫৮

৩. পল্লব সেনগুপ্ত : 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, পৃ. ১৭

৪. গোপাল হালদার : 'সংস্কৃতির রূপান্তর', কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৪২

৫. E.B.Taylor : 'Religion in Primitive Culture, ed. Paul Rafin, Harper and Row Publishers, New York, 1958 p. 1

৬. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : 'সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস', জিজ্ঞাসা কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ১৪

৭. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'

৮. পল্লব সেনগুপ্ত : প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৯. সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত : 'বাংলা লোকভাষা বিজ্ঞান', লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৫৮

১০. মানস মজুমদার : 'লোকসংস্কৃতি : সংজ্ঞা-স্বরূপ-শ্রেণিবিভাগ ও অনুশীলন পদ্ধতি', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার সম্পাদিত, 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', রত্নাবলী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ

২০০৬, পৃ. ১৭
১১. আব্দুল হাফিজ : 'লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ', মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৫, পৃ. ৩২
১২. আব্দুল হাফিজ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১৩. Encyclopaedia Britannica, vol. 14 (Magic)
১৪. ধূর্জটি নস্কর : 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৮৩
১৫. আব্দুল হাফিজ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৬. Alexander, H. Krappe : 'The Science of Folklore, W.W Norton and co. New York, 1964, p. 234
১৭. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম : 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন : শিকড় সন্ধান', সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা সমকালের জিয়নকাঠি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২০১০, পৃ. ৩১৭
১৮. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম : 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য', সমকালের জিয়নকাঠি, প্রথম প্রকাশ ২০১৩, পৃ. ৩৬
১৯. মলয় দাস : 'সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৬৮
২০. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম : 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন ও ঐতিহ্য', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
২১. ধূর্জটি নস্কর : 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৮৫
২২. ধূর্জটি নস্কর : 'সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ', শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭, পৃ. ৮৬

তথ্যের সন্ধানে

১. প্রবন্ধে উল্লেখিত মন্ত্র ও তথ্য আহরণে সাহায্য করেছেন ধনঞ্জয় মিদ্দে, বয়স ৬৫, বিখ্যাত বহরদার (গুনিন), মৈপিঠ, কুলতলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২. জেলেজীবনের তথ্য আহরণে সহযোগিতা করেছেন বিশিষ্ট জেলেবর্গ- রবিনদাস (৪৭), সঞ্জয় মণ্ডল (৪৫), কালিপদ মাইতি (৪৮) ও গোপাল স্বামী (৪৭)-দেবীপুর, কুলতলি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৩. বিভিন্ন ধরনের তথ্য আহরণে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন চঞ্চল দাস, দেবীপুর, কুলতলি, দক্ষিণ ২৪পরগনা।